চিন্তন

আঠারো সংখ্যার ব্যাপকতা ও তাৎপর্য

সীতানাথ গোস্বামী

[গত ২৫ মার্চ, ২০১০ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় 'আঠারো সংখ্যার তাৎপর্য' বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বক্তৃতাটির পুনর্লিখন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।—সঃ]

ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়নকালে যে কোনও ব্যক্তি লক্ষ করেন যে, আঠারো, একশো আট ও এক হাজার আট সংখ্যাগুলি প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই সংখ্যাগুলির উপস্থিতি দেখা যায় উপনিষদেও, যেমন উপনিষদের সংখ্যা বলা হয় একশো আট। মুক্তিকোপনিষদে (১।১-৫) বলা আছে প্রত্যেক বেদের অন্তর্গত উপনিষদের সংখ্যা কত; যেমন ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত উপনিষদ হল দশ; শুক্ল ও কৃষ্ণ যর্জুবেদের উপনিষদ যথাক্রমে উনিশ ও বত্রিশ; সামবেদের উপনিষদ ষোলো এবং অথর্ববেদের একত্রিশ। এইভাবে উপনিষদের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ + উনিশ + বত্রিশ + ষোলো + একত্রিশ = একশো আট।

দশখানি প্রধান উপনিষদের মধ্যে প্রথম হল ঈশোপনিষদ। তার কাণ্বশাখাতে মন্ত্রসংখ্যা আঠারো।

মহাভারতের বহুস্থলে আঠারো সংখ্যার উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থের পর্বসংখ্যা আঠারো, যুদ্ধের দিনসংখ্যা আঠারো, উভয়পক্ষের মোট সৈন্য আঠারো অক্ষৌহিণী। মহাভারতান্তর্গত গীতাগ্রন্থের অধ্যায় আঠারোটি। গীতার প্রথমাধ্যায়ে সঞ্জয়ের মুখে দুর্যোধনের মন্তব্য শুনতে পাই যে, পাণ্ডবপক্ষে উল্লিখিত বীরগণ আছেন—ভীম, অর্জুন, যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, কুন্তিভোজপুত্র পুরুজিৎ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র যথা যুধিষ্ঠিরতনয় প্রতিবিন্ধ্য, ভীমপুত্র সুতসোম (নামান্তর শ্রুতকীর্তি), অর্জুনসুত শ্রুতকর্মা, নকুলপুত্র শতানীক ও সহদেবপুত্র শ্রুতসেন। এই সংখ্যা আঠারো কিন্তু বিপরীতক্রমে কৌরবপক্ষে বীরের উল্লেখ পাই মাত্র আট জনের—দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ।

এবার শঙ্খবাদকের নাম আলোচনাতেও দেখতে পাই যে, পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খবাদক হলেন আঠারো জন, অন্যদিকে কেবল ভীষ্মই শঙ্খবাদক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন, অন্যেরা তাঁর অনুকরণ করে পরে শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। তাঁদের কারও নাম উল্লিখিত হয়নি। পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খ বাজিয়েছিলেন বলে যাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে—কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র—মোট আঠারো জন।

গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের আলোচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আলোচনায় (৫৫-৭২) মোট আঠারোটি শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে।

পুরাণের সংখ্যা আঠারো, উপপুরাণের সংখ্যাও

আঠারো এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাণ ভাগবতের শ্লোকসংখ্যা আঠারো হাজার।[১] জন্মের ঠিক পরই শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দগৃহে আনীত হলেন তখন নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভাগবতে সেই নন্দোৎসবের বর্ণনায় শ্রীশুকদেব মোট আঠারোটি শ্লোকের সাহায্য নিয়েছেন (১০।৫।১-১৮)।

এখন জপের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা জপ করলে অবশ্যই করি দশবার বা একশোবার বা এক হাজারবার। এমনটা সংক্ষেপে বলা হলেও বস্তুত আমরা আচার্যদের কাছে জানি যে, দশবার অর্থাৎ আঠারোবার, একশোবার অর্থাৎ একশো আটবার, একহাজারবার অর্থাৎ এক হাজার আটবার করণীয়। এই অতিরিক্ত আট সংখ্যা গণনার একটি নির্ধারিত পদ্ধতিও আছে। যে কোনওভাবে এই আট গণনা করা চলে না, এমনকি দশ সংখ্যা গণনার পদ্ধতিতে এক থেকে আট গণনা করা রীতিবিরুদ্ধ কিন্তু এক বাদ দিয়ে দুই থেকে নয় পর্যন্ত গণনা করলেই আট সংখ্যার গণনা করা হয়ে যায়।

আরও কথা, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে যে জপ হয়ে চলেছে, তা আমাদের ইচ্ছানুসারী নয় কিন্তু জীবনরক্ষার জন্য বায়ুত্যাগ ও বায়ুগ্রহণই হম্ ও সঃ মন্ত্রে উচ্চারিত হয়ে চলেছে। এটি ইচ্ছাকৃত নয় বলে এর নাম অজপা। এই অজপা হল হংসঃ মন্ত্র, তা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হলে তা 'মরা মরা' থেকে 'রাম' হওয়ার মতো হংসঃ হংসঃ থেকে সঃ হম্ বা সোঽহম্ হয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যদি সেবিষয়ে সচেতন হই। তা বুঝলে মুক্তির পথ খুলে যায় আর না বুঝলে হাঁসফাঁস করাতেই পর্যবসান।

কোনও পরমশ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির নাম উল্লেখের সময় আমরা তাঁর নামের আগে ১০৮ শ্রী বা ১০০৮ শ্রী লিখে থাকি। ওপরের এইসব বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আঠারো, একশো আট এবং এক হাজার আট এইভাবে এক ও আটের মিলিতভাবে ব্যাপক উল্লেখ একেবারে আকস্মিক বা অহেতুক নয়—এর পিছনে কোনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে।

এই তাৎপর্য তথা রহস্য উন্মেষিত করার জন্য প্রথমে বাংলা (তথা সংস্কৃতের) বর্ণমালার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন। অ থেকে ঔ পর্যন্ত বর্ণগুলি হল স্বরবর্ণ। বাকি অন্য বর্ণগুলি ব্যঞ্জন। তার মধ্যে ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি হল স্পর্শবর্ণ। তারপর চারটি বর্ণ যথা য র ল ব অন্তঃস্থবর্ণ। সর্বশেষ শ ষ স হ এই চারটি উষ্মবর্ণ নামেই প্রসিদ্ধ।

আঠারো সংখ্যা উল্লেখের দ্বারা কোনও সংখ্যা বোঝাতে চাওয়া হয়নি। বাল্যকালে আমরা পড়েছি যে, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র ইত্যাদি অর্থাৎ এক সংখ্যার দ্বারা চন্দ্রকে বোঝানো যাবে এবং দুই সংখ্যার দ্বারা মাসের দুই পক্ষ বোঝা যায়। আমাদের ধর্মসংস্কৃতিতে আঠারো সংখ্যার যে তাৎপর্য ঐতিহ্যানুসারে স্বীকৃত হয়ে আসছে তা হল আট সংখ্যার দ্বারা অষ্টম স্পর্শবর্ণকে বুঝতে হবে। অষ্টম স্পর্শবর্ণ হল 'জ'। আবার এক সংখ্যার দ্বারা প্রথম অন্তঃস্থবর্ণ বুঝতে হবে অর্থাৎ এক সংখ্যার প্রতিপাদ্য 'য'। এইদুটি বর্ণ পাশাপাশি রাখলে হয় 'জয়'।

অনেকে মনে করেন যে, এক সংখ্যাই তো প্রথমে এবং আট সংখ্যা পরে আছে সুতরাং 'জয়' না হয়ে 'যজ' হওয়া উচিত। তার উত্তরে বলা হয় যে, কোনও সংখ্যাকে যখন শব্দে প্রকাশ করা হয় তখন ডানদিক দিয়েই আরম্ভ করাই ভারতীয় ভাষার রীতি। যেমন ধরা যাক, ৪৭ সংখ্যা। একে আমরা 'চল্লিশ সাত' বলি না—বলি 'সাতচল্লিশ', হিন্দিতে সাঁয়তালিশ, সংস্কৃতে সপ্তচত্বারিংশৎ। ৮৪কে বলি চুরাশি, চৌরাশি, চতুরশীতি ইত্যাদি। এজন্যই সংস্কৃতে একটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে—'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' অর্থাৎ অঙ্ককে শব্দে প্রকাশ করতে হলে বা শব্দকে অঙ্কে প্রকাশ করতে হলে দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে বামদিকে যেতে হবে। এইভাবে আমরা আঠারো সংখ্যা থেকে 'জয়' শব্দ ও 'জয়' অর্থ পেলাম। শব্দ শোনামাত্র অর্থেরই প্রতীতি হয় একথা সর্বজনগ্রাহ্য।

লক্ষণীয় যে, কৌরবপক্ষের বীরগণের উল্লেখ রয়েছে গীতাতে মাত্র আটজনের কিন্তু তার আগে বাঁদিকে এক সংখ্যা বা দশ আর যুক্ত হল না, তাই আঠারোতে পৌঁছাল না। আবার দেখি যে, কৌরবপক্ষের শঙ্খবাদক মাত্র ভীষ্মই বলে গীতাতে

উল্লিখিত হয়েছেন। সেখানে এক আছে, কিন্তু তার ডানদিকে আট আর যুক্ত হতে পারল না। এর দ্বারা সূচিত হয় যে, কৌরবপক্ষেও জয় আসতে পারত কিন্তু অল্পের জন্য তা আসেনি। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম জয়লাভ করতেই চলেছেন। তাঁর ভয়ংকর মূর্তি ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যসংহার এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, পাণ্ডবপক্ষের বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে যদি ভীষ্মের পরাজয়ের জন্য উদ্যোগী না হতেন তবে পাণ্ডবপক্ষ পরাস্তই হত। শ্রীকৃষ্ণের এমন সিদ্ধান্ত ছিল যে, তিনি শস্ত্র ত্যাগ করবেন এবং যুদ্ধ করবেন না কিন্তু একপক্ষে অর্থাৎ পাণ্ডবপক্ষে বিদ্যমান থাকবেন—'অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ' (মহাভারত, ৫।৭।২০)।

এখন আমরা একটি বিতর্কিত বিষয়ে উপস্থিত হয়ে পড়েছি। তা হল—শ্রীকৃষ্ণ কি সত্যই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছিলেন? ভারতীয় সমাজ এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দিয়েছে। এখানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হয় বটে কিন্তু অনেকেই বলবেন তা হয়নি।

প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ কোনও প্রসিদ্ধ অস্ত্র নেননি, রথের চাকা খুলে নিয়ে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। চাকা কোনও প্রসিদ্ধ অস্ত্র বা শস্ত্র নয়।

দ্বিতীয়ত, এই চক্র শ্রীকৃষ্ণের কোনও গ্রহণীয় অস্ত্র নয়, বরং তাঁর নিত্যসহচর সুদর্শনই।

তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ তো একথা বলেছিলেন যে, আমি পাণ্ডবপক্ষেই থাকব ও তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব। সাহায্য কেবল রথের সারথ্যমাত্র নয়, জীবনেরও।

চতুর্থত, ভক্তের ইচ্ছাই তিনি পূরণ করেছেন। ভীষ্ম তাঁকেই চেয়েছিলেন এবং সেজন্য শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে ধনুর জ্যা আকর্ষণ করেননি, বরং ধীর ও অবিপর্যস্তভাবে বললেন—হে গোবিন্দ, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, হে মাধব, হে চক্রপাণি, এসো এসো তোমাকে প্রণাম করি।... হে কৃষ্ণ, আমি যদি তোমা কর্তৃক হতও হই, তবে তা আমার ইহলোকের ও পরলোকের পরম শ্রেয়। মহাভারতে বলা আছে :

''উবাচ ভীষ্মস্তমনন্তপৌরুষং গোবিন্দমাজাববিমূঢ়চেতাঃ।
এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে॥...
ত্বয়া হতস্যাপি মমাদ্য কৃষ্ণ শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।'' (৬।৫৯।৯৭-৯৮)

সমগ্র মহাভারত পাঠ করলে জানা যায় যে, মহাভারতের বীজমন্ত্র হল 'জয়' এবং মূলমন্ত্র হল 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। মহাভারতের নামও 'জয়'। আদিপর্বে আছে, ''জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা'' (১।৬২।২০) এবং স্বর্গারোহণ পর্বের শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ''জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো মোক্ষমিচ্ছতা'' (১৮।৫।৫১)। বিজিগীষু জয়লাভের জন্য মহাভারত পড়বেন। এই জয় প্রধানত ধর্মের, তারপর ধর্মানুমোদিত অর্থের, অনন্তর ধর্মানুমোদিত কামের ও পরিশেষে মোক্ষলাভের। অন্তে মোক্ষ সুতরাং মহাভারতের অন্তে এই নাম স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আমরা ভারতগ্রন্থের ব্যাপকতা বুঝতে পারি ঠিক পূর্ববর্তী শ্লোকটি থেকে : ''ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।/ যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥'' (১৮।৫।৫০) যাঁরা ধর্মপথে চলবেন তাঁদের জন্য এখানে আছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আর যাঁরা উন্মার্গগামী হবেন তাঁদের জন্যও এখানে আছে অধর্ম, অনর্থ, অকাম ও অমোক্ষ। এই বিপরীত অর্থগুলি চারটি 'চ'-এর দ্বারা সূচিত হয়েছে। যাঁরা উন্মার্গগামী তাঁদের পরাজয়ও ওই একটি পূর্বকথিত মূলমন্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন সকল বিজ্ঞজন কারণ তাঁরা সকলেই বলেছেন : 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। এর দ্বারা তাঁরা বুঝিয়েছেন—যতঃ অধর্মঃ ততঃ অজয়ঃ অর্থাৎ 'যতোঽধর্মস্ততোঽজয়ঃ।' বঙ্গানুবাদ হল—যেখানে অধর্ম সেখানে পরাজয়। এই বাক্যদুটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক হলেও উভয়ের উচ্চারণ একই প্রকার। একথা ভাবলে অবাক হতে হয় যে, মহাভারতের মূল কুশীলবের সকলেই ওই একটি বাক্যের দ্বারা দ্বিবিধ অর্থকেই সূচিত করেছেন।

যদিও সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি অনেকেই এই বাক্যটিকে সময় সময় স্মরণ করেছেন ও অন্যদেরও স্মরণ

করিয়েছেন তবুও গান্ধারীর উক্তিই সর্বাপেক্ষা মর্মপীড়াদায়ক। তাঁর শ্রেষ্ঠ তথা জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন যুদ্ধের প্রতিদিন সকালে মাতার আশীর্বাদ চেয়ে বলতেন : মা, আমাকে আশীর্বাদ করো। কিন্তু গান্ধারী প্রতিদিনই একটি উত্তর দিয়ে গেছেন : যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। গান্ধারী যখন দুর্যোধনের মৃত্যুতে বিলাপ করছিলেন তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ব্যাসদেব বলেন :

''উক্তাপ্যষ্টাদশাহানি পুত্রেণ জয়মিচ্ছতা।
শিবমাশংস মে মাতর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ॥
সা তথা যাচ্যমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা।
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥

(১১।১৪।৮-৯)

—যুদ্ধের আঠারো দিন তোমার পুত্র জয়েচ্ছু হয়ে তোমাকে বলেছিল, ''মা, আমি শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমায় কল্যাণবাণী বলো।'' হে গান্ধারি, সেই তুমি কিন্তু প্রতিদিন জয়েচ্ছু পুত্রের জয়ভিক্ষার উত্তরে বলেছিলে, ''যেখানে ধর্ম সেখানে জয়।'' সুতরাং তুমি তো জানতে তাই এখন আর শোক কর কেন?

অত্যন্ত মর্মপীড়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গান্ধারী শতপুত্রের ধ্বংসের জন্য যুধিষ্ঠিরকে দায়ী করে তাঁকে অভিশাপ দিতে প্রস্তুত। তখন ব্যাসদেব আবার বললেন :

''ক্ষমাশীলা পুরা ভূত্বা সাদ্য ন ক্ষমসে কথম্।
অধর্মং জহি ধর্মজ্ঞে যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥

(১।১৪।১২)

—হে ধর্মজ্ঞ গান্ধারি, তুমি আগে ক্ষমাশীল হয়ে আজ কেন ক্ষমা করছ না? তুমি অধর্মকে ধ্বংস করো। এই হত্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে দায়ী না করে চিন্তা করো 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'।

যুদ্ধের আগে দ্রোণ বড়ো দুঃখে দুর্যোধনকে বলেছিলেন—যুদ্ধ করে কাজ নেই, এই পারিবারিক যুদ্ধ খুবই ক্ষতিকর হবে, তাই বলছি, সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে শান্তির পথে যাও। বেশি কথায় কাজ নেই। আমার কাছে আমার পুত্র অশ্বত্থামা যেমন প্রিয়, অর্জুনও তেমন। সার জেনে রাখো—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। ইঙ্গিতে বোঝালেন—যতঃ অধর্মঃ ততঃ অজয়ঃ। এই আলোচনার সার বিদুর বলেছিলেন একটি বাক্যে—'প্রণষ্টঃ কৌরবো বংশঃ' (৫।১৪৮।১৮) অর্থাৎ বোঝা গেল যে, কৌরব বংশ ধ্বংস হল।

মহাভারতে বিভিন্ন সময় এই কথাটি আরও অনেকে উচ্চারণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে (৯।৬৩।৬০), গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে (১১।১৭।৬), ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে (১৩।১৬৭।৪১), অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে (৬।২১।১১) এবং ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলেছিলেন (৫।৩৯।৯) এই একই মূলমন্ত্র।

যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ভীষ্ম ও তাঁর অনুগামিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি যুদ্ধ ঘোষণা করে শঙ্খনিনাদ করেছিলেন। তারপরই অর্জুনের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ উভয় সেনার মধ্যে নিয়ে গেলে উভয়পক্ষের বীরগণের মধ্যে সকলেই আত্মীয়জন দেখে 'এমন যুদ্ধে আমার কাজ নেই'—একথা বলে রথের ওপর বসে পড়লেন। অস্ত্রাদি সবই পরিত্যাগ করে অর্জুন চরম বিষাদগ্রস্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ গীতা উপদেশ করলেন এবং অর্জুন আবার সুসজ্জিত হলেন যুদ্ধের জন্য। আবার উভয়পক্ষে শঙ্খ ধ্বনিত হল। এমন সময় যুধিষ্ঠির কবচ ও আয়ুধ ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে পায়ে হেঁটে ভীষ্মের অভিমুখে গেলেন। ভীষ্মকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ চাইলেন। এরপর দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ চাইলেন। দ্রোণ বললেন—তোমার জয় হবে কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার মন্ত্রণাদাতা। আর বললেন, ''যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যত কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।'' (৬।৪৩।৬০) এই বাক্যটিও কার্যত মূলমন্ত্রেরই সমতুল্য।

যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
অতএব যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

আঠারো সংখ্যার তাৎপর্য যে জয় তা আগেই বলা হয়েছে কিন্তু একশো আট ও এক হাজার আট সংখ্যার তাৎপর্য কী, তারও বিশ্লেষণ চাই। এক সংখ্যার দ্বারা একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে এবং আট সংখ্যা দ্বারা জড়জগতকে বোঝা যায়। একথা গীতায় ভগবান বলেছেন :

''ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" (৭।৪)

—পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার হল জড় প্রকৃতি। মনের কাজ হল সংশয়, বুদ্ধির কাজ হল নিশ্চয় এবং অহংকারের কাজ গর্ব। চিন্তাজগতে এই গর্ব সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। বস্তুত আমরা সামর্থ্যহীন হলেও ব্যর্থ অহংকার করি। মনের কাজ সংশয়, তা আমাদের বিভ্রান্ত করে। বুদ্ধিও যদি বাহ্য মিথ্যা জড়জগতের আকর্ষণে মলিন হয় তবে আমাদের অধ্যাত্মজীবনে অগ্রগতির আর কোনও উপায় নেই। এইজন্যই ভগবান বলেছেন—বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (২।৬৩)। সুতরাং শুদ্ধ সংস্কৃত বুদ্ধিকে অবলম্বন করেই চলতে হবে যাতে এই মায়িক জগৎ থেকে মুক্তি হয়।

যাই হোক, এক সংখ্যার দ্বারা সূচিত ব্রহ্ম যদি মায়াদ্বারা আবৃত হন তবেই জগতের সৃষ্টি বা আট-এর অস্তিত্ব। তাই যখন এক ও আট-এর মধ্যে মায়াসূচক শূন্য আসে তখন একশো আট বা মিথ্যা সৃষ্টজগতের অস্তিত্ব। এই মিথ্যা জগতের সৃষ্টির মূলে যে মিথ্যা মায়া রয়েছে তা যিনি জানেন তাঁর কাছে জগৎ দৃষ্ট হলেও তিনি সেই জগতকে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ তার দ্বারা আকৃষ্ট বা প্রলোভিত হন না। তিনিই মুক্ত। তাঁর দৃষ্টিতে শূন্যও নেই, আটও নেই, কেবল এক নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মই বিরাজমান।

একই মায়াকে দুভাবে দেখা যায়—যোগমায়া ও মহামায়া। ভগবান যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন এবং সেজন্য মূঢ় জীবগণ সেই ভগবান অজ ও অব্যয় হলেও তাঁকে জানতে পারে না। গীতায় ভগবান বলেছেন,

"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"
(৭। ২৫)

মহামায়ার প্রভাবে আমরা এক ব্রহ্মের স্থানে বিচিত্র জগৎ দেখে থাকি। এক হাজার আট সংখ্যার ক্ষেত্রে এক সংখ্যাটি ব্রহ্মবাচক, শূন্যদ্বয় যথাক্রমে যোগমায়া ও মহামায়ার বাচক এবং আট সংখ্যা প্রকৃতি বা জড়জগতের বাচক। যাঁরা মায়োত্তীর্ণ সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এই একশো আট ও একহাজার আট অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে যে অজপার কথা বলেছি তা আঠারো সংখ্যার সঙ্গে সম্বদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রতি মিনিটে পনেরো বার এই হংসঃ মন্ত্র জপ হয়ে চলেছে। সুতরাং ঘণ্টায় নশো বার এবং অহোরাত্রে একুশ হাজার ছশো বার হয়ে থাকে। এই সংখ্যাটি আঠারো সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য।

শাস্ত্রীয় প্রাণায়ামের নিয়ম হল যে, পূরকে চার জপ করা যায় অর্থাৎ পূরক প্রাণায়ামের সময় যদি চারবার 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ইত্যাদি কোনও মন্ত্র জপ করা হয় তবে কুম্ভকে ষোলো বার জপ বিধেয়, রেচকে আট, পুনরায় বিপরীত মুখে অর্থাৎ পূরকে চার, কুম্ভকে ষোলো এবং রেচকে আট। সুতরাং এইভাবে একটি প্রাণায়ামে ছাপ্পান্ন বার জপ হয়। একসঙ্গে তিনটি প্রাণায়াম করতে হয় বলে এক সন্ধ্যায় একশো আটষট্টি বার জপ হয় এবং তিন সন্ধ্যায় প্রতিদিন জপসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচশো চার, যা আঠারো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। এইভাবে ছয়, আট বা বারো সংখ্যার দ্বারা জপ করলেও প্রতিদিনে জপ সংখ্যা হয় যথাক্রমে সাতশো ছাপ্পান্ন, এক হাজার আট ও এক হাজার পাঁচশো বারো। এই সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটি আঠারো সংখ্যার গুণিতক।[১] প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, পাঁচ, সাত বা নয় সংখ্যার গণনার দ্বারা জপের বিধান নেই।

এবার জপমালার বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাই। মালার মণিকা বা দানা থাকে একশো আটটি একথা সকলেরই জানা। কিন্তু একশো আটটি কেন? জপের দ্বারা হয় মনের সংযম, চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের মালিন্য দূরীকরণের দ্বারা চিত্তের সংস্কার বা শুদ্ধি। চন্দ্রের সঙ্গে মনের নিবিড় সম্বন্ধ। আকাশে নির্মেঘ অবস্থায় যখন চাঁদ ওঠে, বিশেষত পূর্ণ চন্দ্র, তখন মানুষের মনে এক আহ্লাদ বা আনন্দ জেগে ওঠে। চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছে তো বিরাট পুরুষের মন থেকে—'চন্দ্রমা মনসো জাতঃ' (ঋক্‌সংহিতা, ১০।৯০।১৩)। চন্দ্র বারোটি রাশি ও সাতাশটি নক্ষত্রে আবর্তিত হয়। সাতাশটি নক্ষত্রের প্রতিটিতে চার পাদ, মোট একশো আট পাদ। তা বারোটি রাশিতে ২^{১}/৪ (সওয়া দুই) নক্ষত্র হিসেবে থাকে। চন্দ্রের যেমন একশো আটটি পাদ তেমন জপমালারও একশো আটটি মণিকা। প্রতিটি নামের বা মন্ত্রের জপের সঙ্গে অভীষ্ট দেবতার চিন্তা মিলিয়ে

নিলে চন্দ্রস্থানীয় মনেরও সংস্কার হয়। সংযমের দ্বারা চিত্তের বহুবিধ বিক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। জপের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, এই মালাজপের মাধ্যমে জাগতিক বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে এসে ভগবানে বা জপ্য দেবতাতে সংলগ্ন করে অপার আনন্দ লাভ করা।

আনন্দই সকলের কাম্য। আনন্দই ব্রহ্ম। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।৬)। আমরা সকলেই যেন পরমানন্দ লাভ করে জীবন সার্থক করতে পারি।✠

টীকা

১। *'তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে'* (ভাগবত, ১২।১৩।৯)

২। ছত্রিশ সংখ্যাটি আঠারো সংখ্যার গুণিতক হলেও তা কিন্তু মঙ্গলবাচক নয়, এমনটিই মহাভারত পাঠ করলে মনে হয়। পাণ্ডবগণ যুদ্ধজয়ের পর মাত্র ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। মহাভারত যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর কৃষ্ণ তাঁর মর্ত্যদেহ ত্যাগ করেন। অর্জুন গীতার তত্ত্ব ভুলে যাওয়ায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন আর একবার গীতার উপদেশ দেন। ভগবান তাঁর একাজে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, সেই যুদ্ধকালে যেমন বলেছিলাম তা আর এখন বলা সম্ভব নয় তবে ওই তত্ত্বের প্রকাশক বক্তব্য বিভিন্ন বক্তাদের মাধ্যমে প্রকট করতে পারি।

''অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্যস্ত্বং তন্মে সুমহদপ্রিয়ম্।
ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সম্ভবিষ্যতি॥ ''
(মহাভারত, ১৪।১৬।১০)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেমন জয়সূচক আঠারো অধ্যায় বিদ্যমান এই পরবর্তী কালে কথিত অনুগীতার অধ্যায়সংখ্যা কিন্তু ছত্রিশ। এই ছত্রিশ সংখ্যার তাৎপর্য হল—চল বা চঞ্চল বা অস্থির। ছয় সংখ্যার দ্বারা ষষ্ঠ স্পর্শবর্ণ চ বোঝানো হয়েছে এবং তিন সংখ্যার দ্বারা তৃতীয় অন্তঃস্থ বর্ণ ল সূচিত হয়েছে। পাণ্ডবগণের গৌরবের দিন যে চলে যাচ্ছে তারই সূচনা করে দিলেন ভগবান ছত্রিশ সংখ্যার দ্বারা।

আঠারো সংখ্যার গুণিতক হলেও ব্যতিক্রম হিসেবে এই ছত্রিশ সংখ্যাকে অবক্ষয়ের সূচক বুঝতে হবে।

লেখক-লেখিকার প্রতি

সবিনয় নিবেদন,

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখবেন। **আমরা কোনও পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দিই না।**
* আপনার পাঠানো প্রবন্ধের সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরের উল্লেখ যেন থাকে।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* ধর্মীয় প্রসঙ্গ শুধু নয়, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি।
* লেখা ১৫০০ থেকে ২০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতা বা গানের বই সমালোচনার জন্য পাঠাবেন না।
* লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র, ফোটো থাকলে তা ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব লেখকেরই থাকবে।
* প্রবন্ধের সঙ্গে তথ্যসূত্র দিলে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করুন :
  লেখকের নাম/ বইয়ের নাম/ প্রকাশনা সংস্থার নাম/ প্রকাশের স্থান ও বর্ষ/ খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা। তথ্যসূত্র সম্পূর্ণ না হলে রচনা প্রকাশ করা হয় না।
* আমাদের বিশ্বাস, আপনাদের সুলিখিত প্রবন্ধগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলিতুল্য। আশা করি, শ্রীশ্রীমায়ের মঠের পত্রিকায় আপনাদের লেখালেখির ধারা অব্যাহত থাকবে। শ্রীভগবান আপনাদের সারস্বত সাধনা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা। —সম্পাদিকা